বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৫ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৪

গ্রামীণ সমাজে নৈতিক অবক্ষয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামো পুনর্বিন্যাসের প্রভাব: একটি বিশ্লেষণ

সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া*

১। সূচনা

জার্মানির বার্লিন-ভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর দুর্নীতির ধারণা-সূচকে বাংলাদেশ ২০০১ সাল থেকে টানা চার বছর (Transparency International 2005) সমগ্র বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন স্কোর করেছিল। যদিও এটি সত্যিকার অর্থেই এক ধরনের 'ধারণা-সূচক' এবং এর গবেষণা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা নিয়ে নানা যৌক্তিক প্রশ্ন রয়েছে, তথাপি একই মানদণ্ডে মাপা দুর্নীতির তালিকায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে খারাপতম অর্জন কোনো দেশের জন্যই সুখকর নয়। বিশেষ করে একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ও ৩০ লাখ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত একটি দেশের জন্য এ জাতীয় নেতিবাচক অর্জন কেবল অশোভনই নয়, বরং অমর্যাদাকর ও শহীদদের ত্যাগের প্রতি এক ধরনের অশ্রদ্ধা। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিকতার এহেন ধসের শুরু কোথা থেকে, এর কার্যকারণগুলো কী, এবং এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের সম্ভাবনা বা পথই বা কী। এই প্রবন্ধে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজে দুর্নীতির বিস্তার তথা নৈতিক অবক্ষয়ের সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণা অপ্রতুল। এই প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের নৈতিক বিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত স্বরূপ উন্মোচন এবং এর কালক্রমিক অবক্ষয়ের প্রকৃত কারণ নির্ধারণ ও বিশ্লেষণের নিমিত্তে কিছু নিবিড় পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা। লেখকের দীর্ঘ দুই যুগেরও বেশি সময় গ্রামীণ সমাজ, ক্ষমতা ও নেতৃত্ব-কাঠামোর সাথে বসবাস, মিথষ্ক্রিয়া, সমাজের রূপায়ন প্রত্যক্ষকরণ এবং জীবনঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ ও লব্ধ অভিজ্ঞতা এই প্রবন্ধের নির্যাস। প্রথাগত সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণার মতো এই পর্যবেক্ষণগুলো সরলীকরণ করা না গেলেও গুণগত গবেষণার একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ পর্যবেক্ষণজাত বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত এসব অর্ন্তজ্ঞান বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থাকে আরও গভীরভাবে বুঝতে সমাজ ও রাজনীতি বিজ্ঞানের গবেষক ও বিশ্লেষকদের খোরাক হতে পারে। এই প্রবন্ধের অনেকগুলো বিবৃতি ও দাবী গুণগত গবেষণার পূর্বানুমান হিসেবে এবং পদ্ধতিগত গবেষণার প্রাথমিক অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করতে পারে।

*জ্যেষ্ঠ গবেষক, ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স এণ্ড ডেভেলপমেন্ট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।

২। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা ও নৈতিকতা

বৃটিশ-পূর্ব গ্রাম বাংলায় সম্পদের প্রাচুর্য নিয়ে নানা ঐতিহাসিক বিবরণ উপস্থিত থাকলেও[১] কৃষি-ভিত্তিক বাংলার গ্রামীণ সমাজ আগাগোড়াই জীবিকা-নির্ভর ছিল।[২] যেকোনো সমাজ প্রগতির মূল সূত্র হচ্ছে উদ্বৃত্ত সম্পদের সংস্থান যেখান থেকে বিশেষায়িত জ্ঞান, কলা ও বৃত্তির চাহিদা তৈরি হয়। কৃষি ভিত্তিক যেকোনো সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক হারে উদ্বৃত্ত তৈরি কঠিন কাজ। শিল্প-বিপ্লব-পূর্ব যেসব সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল তাদের সাফল্যের মূলে ছিল কৃষি উৎপাদনের সাংগঠনিক ব্যবস্থাকে উন্নীত করে উৎপাদন ব্যাপক আকারে (industrial scale) নিয়ে যাওয়া। একাজে তারা উৎপাদন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছে এবং উপকরণগুলোর (বীজ, চাষাবাদের পশু) সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ (domestication) করেছে। এ প্রক্রিয়ায় প্রথমে মধ্যপ্রাচের কিছু দেশ ও অঞ্চল কৃষি থেকেই সর্বপ্রথম উদ্বৃত্ত তৈরি করে[৩] এবং সভ্যতা বিনির্মাণ করে। কৃষিভিত্তিক বাংলার গ্রামীণ সমাজে বীজ, পশুপালন নিয়ন্ত্রণের ধারণা স্থানান্তরিত হলেও এখানে ব্যাপক হারে কৃষি উৎপাদনের সাংগঠনিক দক্ষতা ও জ্ঞান হস্তান্তর হয়েছে এরূপ প্রমাণ মেলা ভার, যার ফলে এখানে 'ফার্টাইল ক্রিসেন্ট'-এর মতো ব্যাপক উদ্বৃত্তও তৈরি হয়নি। সুতরাং শিল্পায়ন-পূর্বের কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাতেও বাংলার গ্রামীণ সমাজে উদ্বৃত্ত তৈরি না হওয়ায় এখানে বিশেষায়িত জ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পের চাহিদা সেভাবে তৈরি হয়নি। যদিও এখানে হস্তশিল্প ও তাঁতভিত্তিক বস্ত্র উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের ফলে একটি নির্দিষ্ট বণিক শ্রেণি তৈরি হয়েছিল, যাদের বৈশ্বিক বাণিজ্যিক সংযোগও তৈরি হয়েছিল, এরা ছিল হাতেগোনা, ক্ষুদ্র নগরকেন্দ্রিক এবং গ্রামীণ সামাজিক ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত নয় (McLane 1993)।

প্রশ্ন হচ্ছে, উদ্বৃত্ত তৈরি না হলেও বাংলার গ্রামীণ সমাজে কি দারিদ্র্য ছিল? এর জবাব মিশ্র। গাঙ্গেয় বদ্বীপ হিসেবে নদীমাতৃক বাংলার ভূমির উর্বরতা এ অঞ্চলের মানুষের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিত্যসঙ্গী হলেও বন্যা-উদ্ভূত পলিমাটির উর্বরতা এখানকার কৃষি উৎপাদনকে সাশ্রয়ী ও সমৃদ্ধ করেছে।[৪] যার ফলে ব্যাপক হারে উদ্বৃত্ত তৈরি করতে না পারলেও মানুষ সে অর্থে 'গরিব' ছিল না, বরং ইবনে বতুতার মতো পরিব্রাজকদের লেখায় মানুষের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা স্বাবলম্বীতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যার ফলে 'অভাব-হীন' সমাজে সামাজিক বিবাদ-কলহ, সংঘাত এসবের উপদ্রব কম ছিল। ইউরোপীয় প্রাক-শিল্পায়ন সমাজে সংঘাত ও হানাহানির ইতিহাসের সাথে অভাব ও দারিদ্র্যের সম্পর্ক ওতপ্রোত। সে বিবেচনায় বাংলার গ্রামীণ সমাজে সম্পদের সংস্থান ও বণ্টন নিয়ে নৈরাজ্যের ইতিহাস কম। এরই প্রভাব পড়েছে তৎকালীন 'সামাজিক চুক্তি'-তেও।

কিন্তু এই 'জীবিকা-নির্ভর' (subsistence living) ব্যবস্থাকে (Bose 1986) উৎপাদনের পরবর্তী স্তরে উন্নীত করার কোনো প্রণোদনা বা উৎসাহের প্রমাণ বাংলার গ্রামীণ সমাজের ইতিহাসে পাওয়া যায় না, যার ফলে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছে এরূপ উদাহরণ

---

[১] মরক্কান পরিব্রাজক ইবনে বতুতার বিবরণে প্রাচীন বাংলার শৌর্য-বীর্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় (Yule 1866)।

[২] প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে, বঙ্গের ভূমিকা ছিলো প্রান্তিক। উত্তর ভারতে আর্য আধিপত্যের সময়, আর্যরা পূর্বে বসবাসকারী মানুষগুলোকে অবজ্ঞাভরে দেখতো এবং তাদেরকে 'ব্রাত্য' বা 'কিকাতাস' হিসেবে সম্বোধন করতো। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও এজাতীয় অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ পাওয়া যায় (Sengupta 2011)।

[৩] Jared Diamond তাঁর চিরায়ত গ্রন্থ Guns, Germs, and Steel-এ যেটিকে *Fertile Crescent* হিসেবে চিত্রিত করেছেন (Diamond 1997)।

[৪] Sengupta (2011)।

বিরল।[৫] এছাড়া ইউরোপীয়ান শিল্প-বিপ্লবের ছোঁয়া বাংলার গ্রামীণ সমাজের উৎপাদন-বণ্টন ব্যবস্থায় মাত্র কয়েক দশক আগ পর্যন্তও সেভাবে লাগেনি। যার ফলে গ্রামীণ কৃষি উৎপাদন-বণ্টনে যান্ত্রিকীকরণও (mechanization) ঘটেনি এবং উৎপাদন পূর্বের স্তরেই রয়ে গেছে। উৎপাদন পদ্ধতি যুগ-যুগ ধরে অপরিবর্তিত থাকলেও জনসংখ্যার উচ্চ-প্রবৃদ্ধি চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যে ধীরে ধীরে চাপ তৈরি করে। কফিনের শেষ পেরেকটি ছিল ব্রিটিশ কলোনিয়াল শাসনের চৌর্যবৃত্তি ও জবরদস্তিমূলক সম্পদ উৎপাটন। এটি গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে আঘাত করে। একটা কৃষি-ভিত্তিক 'স্বয়ম্ভর' ও 'স্বাবলম্বী' সমাজ কিভাবে লুটপাটের ফলে দরিদ্রক্লিষ্ট হয়ে পড়তে পারে তার উত্তম উদাহরণ বাংলাদেশ (Ray 2011)। চাহিদা ও যোগানের ব্যবধানে অস্বাভাবিক তারতম্য সীমিত সম্পদের উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করে। সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে যার ফলে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও কলহের সূত্রপাত হয়। ব্রিটিশ-পরবর্তী সময়েও এই ধারা অব্যাহত থাকে। একদিকে উৎপাদনের স্থিতাবস্থা অন্যদিকে জনসংখ্যার উল্লম্ফন - এই দুইয়ের সমন্বয়ে বাংলার গ্রামীণ সমাজে দারিদ্র্য বেড়েছে জ্যামিতিক হারে।

ফলস্বরূপ গত কয়েকশ' বছর ধরে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সংগ্রাম ছিল গ্রামীণ মানুগুলোর নিত্য লড়াই। যেকোনো সমাজেই আভ্যন্তরীণ লড়াইটা ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সম্পদকে কেন্দ্র করে হলেও গ্রাম বাংলার মূল লড়াইটা কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছিল বেঁচে থাকার সংগ্রামের। একজন দরিদ্র মানুষকে নৈতিক হতে বলা তার সাথে উপহাস করার সামিল। কেবল ধর্মই তার ক্ষুধা ও অনৈতিক আচরণের মাঝে দেয়াল হতে পারে। বাংলার গ্রামীণ সমাজে দরিদ্রতার নীরব সহিংসতার মাঝে ধর্ম কিছুটা এই দেয়ালের কাজ করেছে এবং নৈরাজ্যকে সীমিত রেখেছে। ইসলাম ধর্ম বাংলার গ্রামীণ সমাজে সূফীবাদের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করার ফলে প্রথাগতভাবে সমাজের ক্ষমতা ও দ্বন্দ্বে এর ভূমিকা ছিল কম সক্রিয়। কিন্তু ক্রমশ দরিদ্রতা-সৃষ্ট সংঘাতে যে নৈতিক ধস তৈরি হয় এবং প্রথাগত সামাজিক চুক্তিতে যে চিড় ধরে, এই বিবর্তনে ধর্ম সামাজিক চুক্তিতে শক্তিশালী হয়ে অনুপ্রবেশ করেছে। ধর্মীয় ন্যারেটিভ সামাজিক অস্থিরতা ও নৈরাজ্যের রাশ টেনে ধরতে ও স্থিতিশীল করতে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। ধর্মীয় নেতৃত্বের এই ভূমিকা তাদেরকে ক্ষমতা কাঠামোয় অনুপ্রবেশ করার সুযোগ প্রদান করে।

৩। বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো

ব্রিটিশ-পূর্ব বাংলার 'স্বয়ম্ভর' গ্রামীণ সমাজের অলিখিত 'সামাজিক চুক্তি'-তে স্থানীয় জোতদার ও সামন্ত-বয়ঃজ্যেষ্ঠদের নিয়ন্ত্রণ ছিল একচ্ছত্র। রাজদণ্ডের নৈকট্যে থাকা ও খাজনা সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত সামন্তগণ সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করেন।[৬] মুসলিম মোগল শাসনামলে এদের বেশিরভাগই ছিল মুসলিম সামন্ত। তারা এক ধরনের 'গ্রামীণ এলিট' হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেদের বলয়ে একটি 'অভিজাততন্ত্র' চালু করেন যেখানে শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক নেতৃত্ব, রাজ দায়িত্ব-কর্তব্য নিজেদের মধ্যে আবর্তিত হতো (R.McLane 1993)। বাংলায় ব্রিটিশ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার পর শুরুতে এই অভিজাতদের হাতেই

[৫] ঐতিহাসিক John R.McLane দাবী করেছেন যে, যদিও 'বঙ্গ দৃশ্যত উর্বর ও উৎপাদনশীল ছিলো... বস্তুত কেউ [কোনো ইতিহাসবিদ] এটা দাবী করেননি যে বঙ্গের লোকজন স্বচ্ছল ছিল' (R.McLane 1993:30)।

[৬] *ibid.*, p.29।

ক্ষমতা থেকে যায়, কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম পর্যায়ে এই অভিজাতগণ ব্রিটিশদের কাছ থেকে সম্পদের ইজারা বুঝে নেন। কিন্তু অতিশীঘ্রই জবরদস্তিমূলক, নিপীড়নবাদী খাজনা ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়লে ব্রিটিশ দখলদারগণ এসব মুসলিম অভিজাতদের বেশিরভাগের কাছ থেকে 'বন্দোবস্ত' কেড়ে নেন এবং পরবর্তী নতুন বন্দোবস্তে অধিকাংশ মুসলমান এলিটদের স্থলে হিন্দু এলিটগণ স্থলাভিষিক্ত হন। মুসলমান এলিটগণ ধর্মীয় পরিচয়ে 'মেজোরিটি'-ভুক্ত হওয়ায় ব্রিটিশদের প্রাতিষ্ঠানিক 'দালাল' হওয়া সত্ত্বেও তারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের অংশ হিসেবে এক ধরনের লেজিটিমেসি দাবী করতো। সম্ভবত সে কারণে কম নিপীড়নবাদীও ছিল, যদিও এর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণের অপ্রতুলতা রয়েছে। কিন্তু স্থলাভিষিক্ত হিন্দু জমিদারগণ সংখ্যালঘু হওয়ায় তাদের দুই দিক থেকেই লেজিটিমেসির সমস্যা দেখা দেয়। একদিকে তারা ব্রিটিশ দখলদারদের প্রতিনিধি, অন্যদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। ব্রিটিশদের নিপীড়নবাদী ভূমিকার কারণে জমিদারগণ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বভাবতই এক ধরনের অনাস্থা, অবিশ্বাস ও শত্রু-মিত্র সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। পাশাপাশি সংখ্যালঘু পরিচয়ের কারণে তাদের সামাজিক লেজিটিমেসিও দুর্বল হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ হিন্দু এলিট পারস্পরিক আস্থা তৈরির প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে বরং আরও বেশি নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। হিন্দু এলিটগণ তথাকথিত মুসলিম গ্রামীণ জোতদার ও সামন্তদেরকে খাজনা আদায়ে সম্পৃক্ত করে কিছুটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালান। সামাজিকভাবে ভারসাম্যহীন এসব সম্পর্কের একটা তীব্র নেতিবাচক প্রভাব গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা ও ক্ষমতা কাঠামোয় পড়েছে। এ প্রক্রিয়ায় এক ধরনের চাটুকারিতা, অনৈতিক সম্পর্ক এসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঝেঁকে বসে। তথাপি এসব এলিট (জমিদারগণ) ও তাদের সামন্তগণ নিজেদের আভিজাত্য ও গ্রামীণ সমাজে তাদের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়।

৪। বাংলাদেশের প্রথাগত গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সাথে সামাজিক নৈতিকতার সম্পর্ক

ব্রিটিশ দখলদারিত্বের অবসানের পর পাকিস্তান যুগে ১৯৫০ সালে বাংলায় জমিদারি প্রথা বিলুপ্তিতে হিন্দু জমিদারগণ তাদের সম্পদ ও প্রাধিকার হারালেও গ্রামীণ সমাজের শাসন ব্যবস্থা, নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কেবল মুসলিম জোতদার ও সামন্তগণের হাতে স্থানান্তর হয়, সাধারণ কৃষক ও জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন হয় সামান্যই (Harris 1989: 247)। কিন্তু নতুন পরিস্থিতি-সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা মোকাবেলায় এবং নিজস্ব ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও আভিজাত্য টিকিয়ে রাখতে তারা স্থানীয় জোতদার ও আধা-সামন্ত গোষ্ঠীর সাথে এক ধরনের ক্ষমতা-ভাগাভাগি ও আপোষের মাধ্যমে সামাজিক স্থিতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। এক ধরনের অলিখিত সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে এই ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পূর্বোক্ত সামাজিক ক্ষমতা কাঠামো বিলুপ্ত না হলেও নতুন রূপে বিকশিত হয়। এই ভারসাম্য ও সামাজিক চুক্তি স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশেও টিকে থাকে। এটা অভূতপূর্ব যে, আশির দশকের আগ পর্যন্ত বাংলার গ্রামীণ সমাজের উৎপাদন-বণ্টন ব্যবস্থায় আধুনিকতার উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব পড়েনি।[৭] গ্রামীণ ক্ষমতার ভরকেন্দ্র যার ফলে ঘুরেফিরে সামন্ত, আধা-সামন্ত ও জোতদারদের হাতে থেকেছে। এর সম্ভাব্য ফল হয়েছে এই যে, যেহেতু এই ক্ষমতার একটা পরম্পরা

[৭] এখানে কৃষি উৎপাদনে অল্পবিস্তর যান্ত্রিকীকরণ শুরুই হয়েছে ১৯৭০ দশকে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭০ সালে সারা দেশে গভীর নলকুপের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯৭০টি, যেখানে ১৯৬০ সালে একটিও ছিল না। এ সংখ্যা পরবর্তী বছরগুলোতে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং ২০০৬ সালে দাঁড়ায় ২৮,২৮৯ টিতে। ১৯৭০ সালে উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল উৎপাদনের হার ছিল মাত্র ৮ শতাংশ, যা ২০০৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ৮৭ শতাংশ। সার-কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ ছিল হেক্টর প্রতি মাত্র ১৩ কেজি, যা ২০০৬ সালে দাঁড়ায় ২০৬ কেজি (Roy and Singh 2008:85) ।

ছিল এবং দীর্ঘ সময় পারিবারিক ও বংশলতিকায় এটি হস্তান্তর হয়েছে, সেকারণে সমাজে মোটামুটি পর্যায়ের সুশাসন নিশ্চিত করা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় তারা নিজেদের স্বার্থেই সচেষ্ট থাকার কথা। অর্থাৎ দারিদ্র্যক্লিষ্ট সমাজে এই সামন্ত পরিবারগুলোর বেশিরভাগই তর্কসাপেক্ষে নিজেদের কিয়ৎ নিপীড়ক-ভূমিকাকে আড়াল করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক মেমোরি, দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ প্রজ্ঞা ব্যবহার করে নৈতিকতা ও আস্থার একটা মানদণ্ড বজায় রেখে সামাজিক অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।

৫। অর্থনৈতিক উদারীকরণ, প্রবৃদ্ধি ও প্রগতি এবং গ্রামীণ সমাজে এর প্রভাব

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আশি ও নব্বই দশকে দুটি বড় ঘটনা ঘটে। এই সময়ে বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্প ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে[৮] এবং প্রায় একই সময়ে বহির্মুখী অভিবাসনের হার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়।[৯] বাংলাদেশের অর্থনীতির নব্বই-পরবর্তী উল্লম্ফনে এ দুটি বিষয় ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। নব্বই ও বিংশ শতকের শেষ দশকে বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার মূলে প্রবাসীদের রেমিটেন্স ও বিকশিত বস্ত্র শিল্পের রপ্তানি থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার অবদান অসামান্য। অর্থনৈতিক এই প্রবৃদ্ধির ফলে দেশের অবকাঠামো, শিল্পায়নসহ সামগ্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। প্রবাসী শ্রমিকদের একটা বড় অংশই বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দা এবং তাদের প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচনা করেছে। এছাড়া বস্ত্র শিল্প খাতে নিয়োজিত প্রায় অর্ধ-কোটি স্বল্প-দক্ষ, অদক্ষ শ্রমিকের প্রায় ৮০ ভাগই নারী (BGMEA 2014), যাদের বেশিরভাগই আবার বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলো থেকে জীবিকার সন্ধানে শহরে আসা প্রান্তিক মানুষ। এই দুই খাতের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে যে প্রাণের সঞ্চার হয় সেখান থেকে কেবল নতুন-নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিস্তৃত ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ সহায়ক শিল্পখাতই কেবল বিকশিত হয়নি, এসব শিল্পকে সহায়তা করার জন্য সেবা খাতেরও ব্যাপক প্রসার হয়েছে এবং অসংখ্য ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সামগ্রিক এই ইতিবাচক পরিবর্তনের গতিধারায় তৈরি হয়েছে ছোট-বড় অসংখ্য উদ্যোক্তা, যাদের একটা বড় অংশ গ্রাম থেকে শহরে আসা প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি।

এই অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞের ফলে বাংলাদেশের দরিদ্র-পীড়িত গ্রামীণ অর্থনীতিতে সম্ভবত বাংলার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এতটা ব্যাপক আকারে অন্তর্মুখী অর্থ-প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়। গ্রামের সাধারণ মানুষের হাতে নগদ টাকার সরবরাহের ফলে সেখানে ভোক্তা ব্যয় প্রবৃদ্ধি, কৃষি পণ্যের দামে উল্লম্ফন (যার ফলে কৃষকদের লাভবান হওয়া), কৃষিভিত্তিক উদ্যোক্তা তৈরি (মৎস্য, ডেইরি, হ্যাচারি খামারের ব্যাপক বিস্তার) এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও সেবাখাতের বিকাশ গ্রামীণ সমাজে এক অভূতপূর্ব নবজাগরণ তৈরি করে।

---

[৮] ১৯৭৭ সালে 'বৈশাখী গার্মেন্টস' এবং ১৯৭৮ সালে 'দেশ গার্মেন্টস' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী বস্ত্র শিল্পের যাত্রা শুরু হয়, যা গত তিন দশকের বেশি সময় ধরে বিকশিত হয়ে বর্তমানে দেশের রপ্তানি খাতে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ৮০ ভাগের বেশি যোগানদাতা খাতে পরিণত হয়েছে।

[৯] উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৩ সালে প্রবাসী শ্রমিকদের কাছ থেকে বাংলাদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ছিল মাত্র ২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (Keely & Tran 1989: 509), যা ২০১৬-১৭ সালে দাঁড়ায় প্রায় ১২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (Bangladesh Bank 2017)।

আরেকটি বিষয় এই রূপায়নকে ত্বরান্বিত করেছে। সেটি হলো 'গণতন্ত্র'। মোগল-বৃটিশ-পাকিস্তান আমলের হাজার বছরের বাংলার গ্রামীণ সমাজে নেতৃত্ব নির্বাচনে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের ইতিহাস দুর্লভ। উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নেতৃত্ব ও তা মেনে চলার বাধ্যবাধকতার ধারণা জনগণের মনোজগতে গেঁড়ে বসেছিল। যার ফলে মোগল আমলের কাজী কিংবা ব্রিটিশ আমলের জমিদার, অথবা ব্রিটিশ-পরবর্তী সময়ে আধা-সামন্তিক শাসক শ্রেণীর বৈধতা ও ক্ষমতার উৎস বা হাতিয়ার ছিল 'সরকার বাহাদুর'-এর সাথে এই শাসক শ্রেণির সম্পর্ক। কেবল ১৯৭১-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিকগণের সামনে গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রকৃত সুযোগ উপস্থিত হয় এবং এটি সম্ভব হয় হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাঙালি নিজেদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিগ্রহণ করায়। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্র চর্চা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ভেঙে পড়ে এবং পরবর্তীতে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা আবারও সুদূর পরাহত হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতি ১৯৯০-পরবর্তী গণতন্ত্রের দ্বিতীয় জোয়ারে পরিবর্তিত হয়। এসময়ে দ্বৈবক্রমে অর্থনৈতিক উদারীকরণ ও বিকাশের সাথে রাজনৈতিক পরিবর্তন যুগপৎভাবে মিলেমিশে যায়। দ্বিতীয় গণতান্ত্রিক জোয়ারের সবচেয়ে বড় যে ঢেউ গ্রামীণ সমাজে এসে লাগে তা হলো রাজনৈতিক দলগুলোর সর্বাত্মক বিকাশ এবং তৃণমূলে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার সম্প্রসারণ (Hassan 2013)। বাংলাদেশের প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলোর জাল গ্রামীণ সমাজে পূর্বে থেকেই থাকলেও রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্ভবত কখনোই সামন্ত বা আধা-সামন্ত শ্রেণির হাত থেকে জনগণের হস্তগত হয়নি। ১৯৯০-পরবর্তী গণতান্ত্রিক বিকাশের সময় অন্যান্য নিয়ামক যুক্ত হয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতও বদল হয়। এই সময়ে দুটি প্রধান দলের কার্যক্রমের নিবিড়তা গ্রাম পর্যায়ে অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়, যার ফলে বহু গ্রামে-গঞ্জে সমান্তরাল নতুন নেতৃত্ব শ্রেণি তৈরি হয়।

৬। সামাজিক নৈতিকতায় অর্থনৈতিক রূপায়ন ও ক্ষমতা কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের প্রভাব

অর্থনীতি ও রাজনীতির নবরূপায়নের অত্যাবশ্যকীয় প্রভাব গ্রামীণ সমাজ ও ক্ষমতা কাঠামোয় দুইভাবে পড়ে। প্রথমত, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা তাদেরকে গ্রামীণ জোতদার ও আধা-সামন্তদের প্রায়শ নিপীড়ক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে। তাদের স্বাধীনভাবে বলার, চলার ভাষা তৈরি হয়। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক বিকাশের সাথে সাথে তৈরি হওয়া লক্ষ-লক্ষ নবীন উদ্যোক্তা ও প্রথম প্রজন্মের ব্যবসায়ী শ্রেণির বিশাল অংশ গ্রাম থেকে আসা। এই নব্য ধনিক শ্রেণি অর্থনৈতিক প্রগতির মহাসড়কে চড়ে বিপুল অর্থ-সম্পদের অধিকারী হয়। নব্য এই ধনিক শ্রেণির আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত হয় তাদের সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ায়। তারা গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামোয় নিজেদের অংশ দাবী করে এবং সামাজিক চুক্তি পুনর্লিখন করতে চায়। তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ দিয়ে নিজস্ব অনুগত শ্রেণিও তৈরি হয়। এই দুই বাস্তবতায় সৃষ্টিকৃত 'শেকল ভাঙার উল্লাস'-এর শিকার হয় প্রথাগত ক্ষমতা কাঠামো ও সামন্ত নেতৃত্ব শ্রেণি। শত শত বছর ধরে চলা নিপীড়ক ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করার উচ্ছ্বাসের সঙ্গী হয় প্রথা, ব্যবস্থাকে, সামন্ত নেতৃত্বকে অবজ্ঞা করার অনুশীলন। ভাঙা-গড়ার এই সময়ে গ্রামীণ সমাজের এই রূপায়ন বিবর্তনের নিয়মে এখন এক ধরনের ভাঙন প্রত্যক্ষ করছে। এই ক্রান্তিকালে সবচেয়ে বেশি শিকার হয়েছে প্রচলিত নিয়ম, শৃঙ্খলা, বিশ্বাস ও স্থিতিশীলতা।

যেকোনো সমাজের রূপায়নের ক্রান্তিকালে এই বিষয়গুলো সহজ শিকার। বাংলার গ্রামীণ সমাজেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পুরাতন থেকে নতুন বাস্তবতায় উন্নীত হওয়ার সময়ে যে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছে তা অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও অনিবার্য। পূর্বতন ক্ষমতা কাঠামোর অলিখিত সামাজিক

চুক্তিতে যে আধা-সামন্ত ও জোতদার শ্রেণি সমাজে নেতৃত্ব প্রদান করতেন তাদের হাজার-বছরের বংশ পরম্পরায় তৈরিকৃত সৃষ্ট মূল্যবোধ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। কিন্তু যদিও নব্য ধনিক শ্রেণি বিদ্যমান 'এলিট' ও 'আভিজাত্য'-কে সফলভাবেই চ্যালেঞ্জ করে এবং বিদ্যমান ব্যবস্থাকে উপেক্ষা-অবজ্ঞা করার মাঝে তারা এক ধরনের ধর্ষকামী অনুভূতি খুঁজে পায়, তথাপি সৃষ্ট সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্য তারা পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল না। এছাড়া তারা অনেক ক্ষেত্রেই প্রথম প্রজন্মের নেতৃত্বাকাঙ্ক্ষী হওয়ায় তাদের চিন্তায় প্রাতিষ্ঠানিক মেমোরি, প্রজ্ঞা, স্থিতি ও পরিশীলিতবোধের অভাব ছিল প্রকট। গ্রামীণ নেতৃত্ব কাঠামোয় যার ফলে এক ধরনের নৈরাজ্য দেখা দেয়। এবং এর প্রমাণ এই সময়ে গ্রামীণ সমাজের সহিংসতার উল্লম্ফন। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ঘাটতি দেখা দেয় এবং সামাজিক বিশ্বাসগুলো ভেঙে পড়ে।

লেখকের প্রায় দুই যুগের গ্রামীণ সমাজের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার অভিজ্ঞতায় এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে। দুই যুগ আগেও যেখানে গ্রামীণ সমাজে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক লেনদেন ও বিনিয়োগে (বর্গা চাষে বা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে কৃষি জমি কৃষকদের হস্তান্তর, অর্থ লেনদেন প্রভৃতি) অলিখিত, 'মৌখিক' আশ্বাস বা চুক্তির ভিত্তিতে করা হলেও লিখিত 'চুক্তি' করার প্রচলন ছিল দুর্লভ। সেখানে বর্তমানে এ ধরনের চুক্তি না করার উদাহরণই বরং দুর্লভ। পূর্বের এই অলিখিত লেনদেনের ভিত্তি ছিল পারস্পরিক দৃঢ় বিশ্বাস, আস্থা ও সামাজিক মূল্যবোধ - যেখানে চুক্তি ভঙ্গের জন্য কেউ আইনি শাস্তির চেয়ে সামাজিক নিন্দা ও প্রতিক্রিয়াকে বেশি ভয় পেতো। বর্তমানে পূর্বের মূল্যবোধ ও সামাজিক চুক্তি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ায় এরূপ অলিখিত চুক্তি ভঙ্গের উদাহরণ যত্রতত্র। সামাজিক মূল্যবোধের এই ঘাটতি গ্রামীণ মানুষের সামগ্রিক নৈতিক আচরণকে তীব্র ঝাঁকুনি দিয়েছে। প্রতিষ্ঠিত সামাজিক মূল্যবোধকে অবজ্ঞা করার সংস্কৃতি সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সামাজিক সম্পর্কগুলোকে নাড়িয়ে দিয়েছে। পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

সামাজিক নৈতিক ধসের পেছনে গ্রামীণ নেতৃত্ব কাঠামো ও মূল্যবোধে ভাঙনের পাশাপাশি আরেকটি যুগপৎ কিন্তু অভূতপূর্ব কারণ দায়ী। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উদারীকরণ-সৃষ্ট অর্থনৈতিক বিকাশ ও প্রবৃদ্ধি মোটাদাগে অনিয়ন্ত্রিত ছিল। বিশেষ করে আইনের শাসনের ঘাটতি ছিল প্রবল। কেবল ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক চুক্তি বলবতে রাষ্ট্রের আইনি কাঠামোর কিছুটা কার্যকর ভূমিকা ছাড়া [যেটি ছাড়া বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা কঠিন] সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের আইনকানুন ও কর ব্যবস্থা ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করার একটা প্রবণতা বিদ্যমান। কর, শুল্ক ও সরকারি রাজস্ব ফাঁকির জন্য সর্বপ্রকার অসদুপায় অবলম্বন করে দ্রুত সম্পদ অর্জনের তীব্র প্রতিযোগিতা সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যকে গ্রাস করে এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে অনেক স্বনামধন্য, প্রতিষ্ঠিত কিন্তু মোটাদাগে সৎ ব্যবসায়ীরাও এতে জড়িয়ে পড়েন।

পূর্বে উল্লিখিত নব্য ধনিক শ্রেণি, যাদের সংযোগ গ্রামে, তারাও এই অসাধু উপায় অবলম্বনের সুযোগ হাতছাড়া করেননি। যার ফলে তাদের সম্পদ অর্জন ও পুঞ্জীভূত করার সাথে অনৈতিকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। পরবর্তীতে এই ধনিক শ্রেণি যখন গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে একে প্রতিস্থাপনে মনোযোগী হয়েছে, তাদের নৈতিক অবস্থানের দুর্বলতার প্রভাব গ্রামীণ সমাজেও ব্যাপকভাবে পড়েছে। পূর্বের সামন্ত ও জোতদার শ্রেণির ক্ষমতার উৎস ভূমিজাত হওয়ায় এবং সম্পদের উৎস বংশপরম্পরায় হওয়ায় তাদের নৈতিকতার সংকট এতটা প্রকট ছিল না। যদিও অনুগত শ্রেণির সাথে তাদের আচরণ অনেকাংশেই নিপীড়নবাদী ছিল, তথাপি তাদের সম্পদ পরম্পরায় হস্তগত

হওয়ায় তাতে 'আদিপাপ'-এর সংকট ছিল না। এবং ভূমি-সম্পদই যেহেতু তাদের ক্ষমতার উৎস ছিল, নৈতিকতার সংকট তাদের ততটা গ্রাস করেনি। কিন্তু নব্য ধনিক শ্রেণিক বেশিরভাগেরই সম্পদ অর্জনের সাথে 'আদিপাপ' জড়িয়ে যায় এবং এর অত্যাবশ্যক প্রভাব পড়ে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার নতুন সামাজিক চুক্তিতে।

এই সামাজিক অবক্ষয়ের একটা উদাহরণ বেশ প্রচলিত। পূর্বে ঘুষ, দুর্নীতি এ বিষয়গুলো গ্রামীণ সমাজে অবমাননাকর, অমর্যাদাকর ও অশ্রদ্ধার বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতো এবং এসব অপরাধে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তি সমাজে তার অবস্থান ও মর্যাদা হারানোর পাশাপাশি অনেকটা অচ্ছুৎ হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকতেন। কিন্তু বর্তমানে ঘুষ ও দুর্নীতির মহামারীতে গ্রামীণ সমাজে কেবল এ উপায়ে সম্পদ অর্জন কেবল 'প্রায়' গ্রহণযোগ্য মানদণ্ডেই পর্যবসিত হয়নি, বরং নতুন মর্যাদার সূচকেও পরিণত হয়েছে। পূর্বে ঘুষ, দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্তদের সাথে মানুষ সামাজিক সম্পর্কে জড়াতে সংকোচ করলেও বর্তমানে বিবাহ বা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের 'উপরি' আয় (ঘুষের অন্য নাম) একটি অন্যতম বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। নৈতিকতার এই সর্বব্যাপী অবক্ষয় মানুষের ধারণাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে এবং যে কারণে দুর্নীতির ধারণা-সূচকে মানুষের অভিমতই রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে শীর্ষে আসীনে সহায়তা করেছে।

৭। উপসংহারঃ সামাজিক অবক্ষয়ের তলানী ও পুনরুদ্ধারের আশা

প্রশ্ন আসতে পারে এই সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী নৈতিক অবক্ষয়ের শেষ কোথায় এবং এটি কিভাবে পুনরুদ্ধার করতে হবে। অথবা কোথা থেকেইবা শুরু করতে হবে। এই প্রশ্নের জবাব পূর্বের বিশ্লেষণেই রয়েছে। যেসব কারণকে এই নতুন পরিস্থিতির অনুঘটক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো যেকোনো সমাজেরই ক্রান্তিকালের সাথে সম্পর্কিত। একটা সমাজ যখন ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে যায় তাতে নানা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার উপস্থিতি আবশ্যক। গ্রামীণ সমাজে এখন যে ক্রান্তিকাল চলছে সেটি বাংলাদেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন, অভূতপূর্ব। বাংলার গ্রামীণ সমাজে অর্থের এতটা অন্তর্মুখী সরবরাহ হাজার বছরের ইতিহাসে এই প্রথম এবং বর্তমান লক্ষণগুলো এরই নানামুখী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া উদ্ভূত। অর্থনীতির এই বিকাশ শত বছরের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোকে যেমন নাড়িয়ে দিয়েছে, তেমনি ক্ষমতা-কাঠামোর এই ভাঙনে প্রায় অনৈতিক উপায়ে অর্জিত সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার ও প্রসারের অনিবার্য প্রভাব সামাজিক মূল্যবোধ ও ভিত্তিকেও নাড়িয়ে দিয়েছে।

এই ভাঙনের হ্রাস টেনে ধরা বা সমাপ্তি নিয়ে নানা মত রয়েছে। আমার বিশ্লেষণ হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় এই পরিবর্তন ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো সূচিত হয়েছে সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই এর উত্তর নিহিত। যে নব্য ধনিক শ্রেণি শত বছরের প্রবঞ্চনা ও নিপীড়নকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন ক্ষমতা কাঠামো তৈরি করছে ও 'শেকল ভাঙার উল্লাসে' মত্ত, সেই শ্রেণিই দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মে গিয়ে থিতু হবে। যার ফলে তাদের মধ্যেই পরম্পরায় একটি নতুন 'আভিজাত্য' গড়ে উঠবে যার একটি 'প্রাতিষ্ঠানিক মেমোরি' থাকবে। এছাড়া এই কয়েক প্রজন্মের অভিজ্ঞতায় তারা প্রত্যক্ষ করবে যে বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, অনৈতিকতা তাদের ক্ষমতারোহণের পথ হলেও এই পথ দীর্ঘায়িত হলে তাদের নিজেদের অবস্থানই ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে চক্রাকারে নতুন শ্রেণির হাতে ক্ষমতা আবর্তিত হবে। আমার পূর্বানুমান হচ্ছে এই উপলব্ধি ঘটবে এবং এই উপলব্ধিই তাদেরকে পূর্ববর্তী অভিজাত ও এলিটদের অনুশীলন করা কিছু 'মূল্যবোধ' ফিরিয়ে আনতে বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে অথবা স্থিতিশীলতার সন্ধানে নতুনভাবে মূল্যবোধ

আবিষ্কার করতে প্রণোদিত করবে। পাশাপাশি প্রথম প্রজন্মে সম্পদ অর্জনের যা-কিছু অনৈতিকতা সেটিও সময়ের আবর্তনে, কিংবা রাষ্ট্রের আইনি শাসনের বিকাশে একসময় মিইয়ে পড়বে এবং তাদেরই দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্ম ব্যবসায়িক নৈতিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে। কারণ তারা উপলব্ধি করবে যে প্রলম্বিত অনৈতিকতা তাদের নিজেদের স্বার্থকেই দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এ সকল বিষয়ের সমন্বয়ই নব্য ক্ষমতাসীন শ্রেণির দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মে এক ধরনের প্রজ্ঞা তৈরি হবে যা সামাজিক শৃঙ্খলা ও মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

Bangladesh Bank (2017): "*Yearly Data of Wage Earners Remittance*." Retrieved from https://www.bb.org.bd/econdata/wageremitance.php# [Accessed on 22 January 2018]

BGMEA (2014): "*A Success Story of RMG Sector,*" Retrieved from http://bgmea.com.bd/home/pages/aboutus [Accessed on 24 January 2018]

Bose, Sugata (1986): *Agrarian Bengal: Economy, Social Structure and Politics*, Cambridge: Cambridge University Press, pp.33-34.

Diamond, Jared (1997): *Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies*, New York: W.W. Norton & Company.

Harris, Michael S. (1989): "Land, Power Relations and Colonialism: The Historical Development of the Land System in Bangladesh," *Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems and World Economic Development*, 18(3/4): 265-279.

Hassan, Mirza (2003): *Political Settlement Dynamics in a Limited-Access Order: The Case of Bangladesh*, ESID Working Paper No 23. Available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2386698

Keely, C. B., and B. N. Tran (1989): "Remittances from Labor Migration: Evaluations, Performance and Implications," *The International Migration Review*, 23(3): 500-525.

R.McLane, John (1993): *Land and Local Kingship in Eighteenth-century Bengal*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp.30-31.

Ray, Indrajit (2011): *Bengal Industries and the British Industrial Revolution*, London: Routledge.

Roy, K. C. and Gajendra Singh (2008): "Agricultural Mechanization in Bangladesh," *Agricultural Mechanization in Asia, Africa, and Latin America*, 29(2): 83-93.

Sengupta, Nitish (2011): *Land of Two Rivers: A History of Bengal from the Mahabharata to Mujib*, Kolkata: Penguine, p.28.

Transparency International (2005): *Corruption Perception Index 2001-2004*, Berlin: Transparency International.

World Bank (2003): *International Migration, Remittances, and the Brain Drain: A Study of 24 Labor-Exporting Countries*, World Bank Policy Research Working Paper No. 3069, Washington: World Bank.

Yule, Henry (1866): *Cathey and the Way Thither*, London: Hakluyt Society, p.457.